গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ২৬ মার্চ - ১ এপ্রিল ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

তিন কোটি রেশনকার্ড বাতিলের তীব্র বিরোধিতা

এস ইউ সি আই (সি)-র

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে তিন কোটি রেশনকার্ড বাতিল করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, আধার সংযুক্তি হয়নি— এই অজুহাত তুলে যেভাবে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে না জানিয়ে তিন কোটি মানুষের রেশনকার্ড বাতিল করা হয়েছে, সেই ঘটনায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে তলব করেছে। স্টেটাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, চোখের মণি, বুড়ো আঙুলের ছাপ, নামের গণ্ডগোল, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সমস্যা ইত্যাদি কারণে এই দরিদ্র মানুষগুলির খাদ্য সুরক্ষার অধিকার বিপন্ন।

আমরা মনে করি, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতাই এর প্রধান কারণ এবং এর ফলে দেশে অনাহারে মৃত্যু বেড়ে চলেছে। বিজেপি সরকারের আরেকটি ষড়যন্ত্র হল, খাদ্যে ভরতুকি কমানো এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভরতুকি পাঠানোর নামে ধাপে ধাপে রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া। আমাদের দাবি, অবিলম্বে সরকারকে বাতিল রেশন কার্ড বৈধ ঘোষণা করতে হবে এবং গরিব মানুষের উপর এই আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

সিঙ্গুরে কারখানা হলেই আসত শিল্প!

তা হলে গুজরাটে ন্যানো বন্ধ কেন

প্র ঃ আগের সব ভোটের মতো এবারের ভোটেও শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষের প্রতিশ্রুতি ‘কর্মসংস্থান ও শিল্পায়ন’। সিপিএম জোট তো ইস্তাহারে বলেছে, ‘এই বারে বাম চাই, চাকরির খাম চাই, সব হাতে কাজ চাই’। বিজেপির স্লোগান ‘আর নয় বেকারত্ব’। কিছুদিন আগে তারা ৭৫ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতিওয়ালা কার্ড বিলিও করে ফেলেছিল। আর তৃণমূল সরকার তো ক্ষমতায় আসার পর প্রায় প্রতি বছর শিল্প সম্মেলন করে ব্যাপক কর্মসংস্থানের স্বপ্ন ফেরি করে চলেছে। কিন্তু বাস্তবে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। বিজেপি আমলে বেকারত্ব অতিমারির আগেই সারা দেশে ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ডে পৌঁছে গেছে। তা হলে কোন দলের বদলে কোন দলকে সরকারকে বসালে বেকার সমস্যার সমাধান হবে?

উঃ সরকার যে দলেরই হোক না কেন, মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এই দলগুলির সব প্রতিশ্রুতিই ভুয়ো। দলের কিছু কর্মী সমর্থকদের চাকরি দিতে পারলে দলে তাদের ধরে রাখতে সুবিধা হয়। তাতে ভোট রাজনীতিতেও সুবিধা দেয়। এ তো সহজ কথা। ফলে চাকরি দেওয়ার সুযোগ থাকলে তারা কিছু দেয়ও। কিন্তু কোটি কোটি বেকার যুবক-যুবতীর সমস্যা কি তাতে মিটবে? বাস্তবে সে সুযোগ কোথায়? চাকরি দিতে হলে গড়ে তুলতে হবে একের পর এক শিল্প। শিল্পায়নের মানে তো লাগাতার শিল্প গড়ে ওঠা। এখন কি ভারতের কোনও

দুয়ের পাতায় দেখুন

মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে চলেছেন কোচবিহারের দিনহাটা ও সিতাই কেন্দ্রের প্রার্থীরা

কর্মীদের উপর নামবে ভিআরএসের খাঁড়া

বিপন্ন হবে জনতার আমানত

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ

কী শিক্ষা রেখে গেল ১৫-১৬ মার্চের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট?

রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ৯টি ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ) এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (এআইবিইইউএফ) এই ধর্মঘট ডেকেছিল। ধর্মঘটের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রম কমিশনারের মধ্যস্থতায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং ধর্মঘটের আহ্বায়ক ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৩ দফা আলোচনা হয়। কিন্তু কোনও রফাসূত্র মেলেনি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুবাদে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ হবে না — এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত দেশজুড়ে ধর্মঘট পালিত হল।

সমস্ত সরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জনগণের টাকায় এবং শ্রমে গড়ে উঠেছে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকার থেকেই শুরু, বর্তমান বিজেপি সরকার তো নির্বিচারে এগুলি জলের দরে পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, ব্যাঙ্ক-বিমা, বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ, পেট্রোপণ্য, কয়লা সহ বিভিন্ন খনিজ, পরিবহন, টেলিকম ইত্যাদি ক্ষেত্রকে ‘স্ট্র্যাটেজিক’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রেখে বাকি সব সরকারি সংস্থাকে বিলগ্নিকরণ এবং ‘স্ট্র্যাটেজিক সেল’ মারফৎ বেচে দিচ্ছে।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে। ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে সংযুক্তির মাধ্যমে ১২টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ২টি ব্যাঙ্ক এবং ১টি বিমা সংস্থাকে দ্রুত বেচে দেওয়া হবে। এজন্য তারা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং বিমা আইনগুলির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের সমস্ত বাধা দূর করতে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি অ্যাক্ট-১৯৭০ এবং ১৯৮০ সংশোধন করছে এবং ইতিমধ্যে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ৪৯ থেকে বাড়িয়ে ৭৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এ দেশের ব্যাঙ্ক শিল্পের ইতিহাস কী? ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

সাতের পাতায় দেখুন

গদির জোরে নয়, আন্দোলনের পথেই একের পর এক দাবি আদায়

এ বাংলা সরকার গঠন করেছে বহুবার। সরকারের স্থায়িত্বও দিয়েছে। আবার পালাবদলও করেছে। কিন্তু সরকারের দ্বারা জনজীবনের সমস্যাগুলির কোনও সমাধানই হয়নি। বরং ইতিহাস বলছে, নির্বাচিত সরকার বিধানসভায় বহু জনবিরোধী নীতি পাশ করিয়ে জনজীবনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে আন্দোলন করতে হয়েছে বারবার। এসইউসিআই (সি) এবং তার বিভিন্ন শাখা সংগঠন এবং গণফোরাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি আদায় করেছে।

আশা ঃ আশাকর্মীদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের লাগাতার আন্দোলনের ফলে কুখ্যাত ফরম্যাট প্রথা বাতিল হয়েছে। চাকুরি ৬০ বছর পর্যন্ত নিশ্চিত ও অবসরকালে ৩ লক্ষ টাকা এককালীন দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি ঃ অল বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়িকাদের মাসিক অনুদান ৭৫০ টাকা ও কর্মীদের মাসিক ১৫০০ টাকা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ৬০ বছর চাকরি এবং

সাতের পাতায় দেখুন

গুজরাটে ন্যানো বন্ধ কেন

একের পাতার পর

রাজ্যে শিল্পায়ন সম্ভব?

প্রঃ অর্থনীতিবিদ থেকে আমলা, দক্ষিণপন্থী দল থেকে সিপিএমের মতো বামপন্থী দল পর্যন্ত বলছে, জমি জটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্প আসেনি। সে জন্য হয়নি কোনও অনুসারী শিল্পও। সত্যিই কি জমিজট সমস্যা?

উঃ জমিজট কথাটা সারা দেশেই চালু আছে। শিল্পের জন্য জমি চাই এ কথা সত্য। কারণ শিল্প তো আকাশে হয় না। কিন্তু জমি পেয়েও শিল্পপতিরা ফেলে রেখেছে কেন? রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যে ৫৮৩টি সংস্থাকে গড়ে ৫.৯ একর, অর্থাৎ ৬ একর করে জমি দেওয়া হয়েছে (আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৮-০২-২০২১)। তারা কি কোথাও শিল্প করেছে? সিপিএম আমলে শোনা যেত রাজ্যে ৫৬ হাজারেরও বেশি কল-কারখানা বন্ধ। এখন তা আরও ১০ হাজার বেড়েছে। ২০১৯ সালের ২ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় জানিয়েছিল সারা ভারতে ৬ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি রেজিস্টার্ড কারখানা বন্ধ। মহারাষ্ট্রে বন্ধ ১ লক্ষ ৪২ হাজার কারখানা, দিল্লির আশপাশ মিলিয়ে বন্ধ ১ লক্ষ ২৫ হাজার কারখানা। গুজরাটে বন্ধ ৩০ হাজারের বেশি। এ সব কারখানা আন্দোলনের জন্য বন্ধ হয়নি। এই সব কারখানার পড়ে থাকা জমি অধিগ্রহণ করে সরকার শিল্প করার সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন? স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ)-এর জন্য অধিগ্রহণ করা ৫৯ হাজার একরেরও বেশি জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে। শুধু গুজরাটেই সেজের জমি পড়ে আছে ১৫ হাজার ৬৪২ একরেরও বেশি। সরকার সেগুলি শিল্পপতিদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে শিল্পের জন্য বিলি করেনি কেন? সেগুলিতেও শিল্প হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বন্ধ কারখানার জমি ছাড়াও অনুর্বর এবং এক ফসলি জমিতে শিল্প হতে পারে। অনুর্বর এলাকার চাষি এবং জমিতে বসবাসকারি সমস্ত পরিবারকে উপযুক্ত দাম, জীবন-জীবিকার গ্যারান্টি সহ সঠিক পুনর্বাসন দিলে, শিল্পে নিয়োগের সুযোগ দিলে তারা জমি দেবে না এমন কথা শোনা যায়নি। বরং জমি পেয়েও শিল্পপতিরা শিল্প গড়েনি তার উদাহরণই বেশি। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে দেখা গেছে বেশিরভাগ শিল্পপতির জমি নিতে যতটা আগ্রহ ছিল, শিল্প গড়তে তার কানাকড়ি পরিমাণও দেখা যায়নি। সমস্যাটা অন্য জায়গায়, সরকার চাষি এবং জমিতে বসবাসকারি মানুষের ন্যূনতম দাবিও না মেনে গায়ের জোরে জমি দখল করে তা শিল্পপতিদের ভেট দিতে চায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হবেই। দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পায়নের নামে বেশি বেশি জমি ওরা পেতে চায় জমি বেচার কারবারের জন্য বা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরির জন্য। শিল্পায়নের ধুয়ো তুলে এ হল জমি হাতানোর এক ধূর্ত কৌশল।

প্রঃ আরেকটা কথাও চালু যে, শ্রমিক আন্দোলনের জন্য বাংলা থেকে শিল্প চলে যাচ্ছে। বা এখানে শিল্প আসছে না। কথাটি কি সত্য?

উঃ একদমই ঠিক নয়। ১৯৭০ সালের পর থেকে গত ৫০ বছর ধরে রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ করে ১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ রাজ্যের সিপিএম-সিপিআইয়ের শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিক আন্দোলনকে আবেদন নিবেদনের গণ্ডিতে বেঁধে রেখেছিল। আর তৃণমূলের ১০ বছরের শাসনে ধর্মঘটের পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে। ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের বেতন কাটার ফতোয়া জারি হয়েছে। যার বিরুদ্ধে সিটু, এআইটিউসি-র মতো আপসকামী অথচ বহরে বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলি দাঁড়াতেই পারেনি। ফলে ধর্মঘট কোথায়? শিল্পে এখন তো একতরফা শান্তি, কেবল মালিকের শান্তি। আর মোদি সরকার তো শ্রম আইন সংস্কার করে ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ধর্মঘটকেও নানা শর্তের কাঁটায় বেঁধে ফেলেছে। বাস্তবে কোনও রাজ্যেই শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন নেই। সরকার এবং সরকারপন্থী আপসকামী ট্রেড ইউনিয়ন মিলে শ্রমিক আন্দোলনে লাগাম পরিয়েছে। শিল্পপতিদের দাবি মতোই সরকার এসব করেছে। ফলে তারা খুশি। এরই পাশাপাশি সরকার প্রায় বিনাসুদে ঋণ, বিনামূল্যে জল, স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ, ট্যাক্স ছাড়, রাস্তা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে দেওয়া ইত্যাদি সবই করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও শিল্প আসছে না। ফলে শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার।

প্রঃ শিল্পপতিরা বলে থাকেন, লাল-ফিতের ফাঁস বা নিয়মের কড়াকড়ি শিল্পায়নের গতিকে শ্লথ করে। কথাটা কি ঠিক?

উঃ লাল ফিতের ফাঁস এখন কোথায়? সরকার এখন পরিবেশের কোনও তোয়াক্কা না করে সহজেই শিল্পের ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। আসলে 'লাল ফিতের ফাঁস' প্রসঙ্গটি তুলে শিল্পপতিরা চায় পরিবেশ সংক্রান্ত, বা শ্রমিকের জন্য দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা, চিকিৎসা, কাজের জায়গায় ন্যূনতম মানবিক ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি যে সমস্ত এখনও আছে, সেগুলি তুলে দেওয়া হোক। যার অর্থ হল পুঁজিপতিরা শিল্প থেকে যেমন খুশি মুনাফা লুটবে, কিন্তু শিল্পের জন্য যে পরিবেশ দূষণ ঘটবে, তাতে শ্রমিক এবং এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন সংশয় হলেও তারা কোনও দায় নেবে না। এটা কি কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারে? আসলে লাল ফিতের ফাঁস, জমিজট বা শ্রমিক আন্দোলন এসব বিষয় তুলে শিল্প সংকটের মূল কারণকেই আড়াল করার চেষ্টা চলে।

প্রঃ শিল্পসংকটের মূল কারণ কী?

উঃ বাজারসঙ্কট। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব। বর্তমানে খাদ্যপণ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি এত বেশি যে, সিংহভাগ মানুষের শিল্পপণ্য কেনার সামর্থ্য নেই। অর্থনীতির গবেষকরা দেখাচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য বিক্রি সংকুচিত হয়েছে ৬৬ শতাংশ। কৃষক পরিবারে ডাল-রাজমা-দুধ-মাছ ফল ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবহার কমেছে ২০ শতাংশের বেশি (সূত্র ঃ ডাউন টু আর্থ, ৩ এবং ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)। আমেরিকার 'পিউ রিসার্চ ফাউন্ডেশন দেখাচ্ছে, কোভিড মন্দার পর ভারতে গরিব এবং নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৯ কোটি। মধ্যবিত্ত মাত্র ৮ কোটি ২০ লক্ষ এবং উচ্চ আয়ের মানুষ মাত্র ২০ লক্ষ। ১৩৮ কোটি জনসংখ্যার দেশে মাত্র এই শেষোক্ত ৮ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কিছু ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা আছে। এইটুকু ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কি শিল্পায়ন হতে পারে? জনগণের এই আর্থিক দুর্দশা তৈরি হয়েছে এবং বেড়ে চলেছে পুঁজিবাদের শোষণ-বঞ্চনার নিয়মেই। এই কোভিড মহামারির মধ্যেই যখন দেশের বেশিরভাগ মানুষের আয় বিপর্যস্ত তখন এ দেশের ধনকুবেরদের আয় বিপুল হারে বেড়েছে। সাধারণ মানুষের সৃষ্ট সম্পদ লুঠ করেই রমরমা হয়েছে তাদের। ফলে অধিকাংশ মানুষ রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে গেছে। যেটাই শিল্পের অগ্রগতির সামনে মন্দার অনিরসনীয় সঙ্কট তৈরি করেছে। এই মন্দা কাটার ব্যবস্থা না করে শুধু প্রতিশ্রুতি দিলেই তো শিল্প হয় না। হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না, সেটা এই কারণে। তৃণমূলও সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া চাকরির খোঁজ পায়নি এ জন্যই। বামফ্রন্ট সরকারও যে ৩৪ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে বেকার বাড়িয়েই গেছে তা এই কারণেই। তারা তাদের আসল প্রভু পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই সত্যটা মানুষকে বলেনি। বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করতে অন্য কোনও মনগড়া কারণকে সামনে এনেছে, আর জমি রক্ষার আন্দোলনকে শিল্প বিরোধী বলে দাগিয়ে দিয়েছে।

প্রঃ তা হলে কি সরকার শিল্প করার চেষ্টা করবে না?

উঃ অবশ্যই করবে। সর্বাধিক যতটুকু চাকরি দেওয়া সম্ভব সেটা সরকারকে করতে হবে। কিন্তু ব্যাপক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের বন্যা বয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা। এ লোকঠকানো। কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবলে সরকারকে প্রথমত, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থায় শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, যা সরকার করছে না। দ্বিতীয়ত, সরকারকে পদ বিলোপনীতি বাতিল করতে হবে। তৃতীয়ত, শ্রম আইনের মধ্য দিয়ে যে ছাঁটাই নীতি বিজেপি সরকার সহজতর করেছে তা বাতিল করতে হবে, চতুর্থত, সমস্ত বন্ধ কারখানা খুলতে প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করে সরকারের উদ্যোগে তা চালাতে হবে, পঞ্চমত, অনুর্বর পতিত জমিতে, এক-ফসলি জমিতে শিল্প করতে হবে। শিল্প করার নামে কৃষক উচ্ছেদ করে বেকার বাড়ানো চলবে না।

প্রঃ বিজেপি এবং সিপিএম উভয়ই বলছে, সিঙ্গুরে একটা সম্ভাবনাময় শিল্পের অপমৃত্যু হল?

উঃ ওরা আগে উত্তর দিক সিঙ্গুর থেকে গুজরাটের সানন্দে ন্যানো কারখানা যাওয়ার পর সেখানকার অবস্থা কী? কেন সেখানে গাড়ি উৎপাদন বন্ধ? ক'জন সেখানে চাকরি পেয়েছিল? আর কতজন জীবিকাচ্যুত হয়ে উচ্ছেদ হয়েছে? সানন্দে যে ন্যানো কারখানা হল, কেন তাতে আজ লালবাতি জ্বলছে? শুধু ন্যানো কেন, জামসেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানাতেও উৎপাদন শক্তিকে অলস করে রাখছে। উৎপাদনের শিফট কমাতে হচ্ছে। চাহিদা তলানিতে। এই চাহিদার সঙ্কটই শিল্পের সঙ্কট। এটাকে বুর্জোয়া দলগুলি আড়াল করতে পারে। বামপন্থীরা করবে কেন? মিথ্যার আশ্রয়ে সিঙ্গুর নিয়ে ভাবালুতা আর কতদিন চলবে?

প্রঃ তা হলে পুঁজিবাদের এই মুমূর্ষু স্তরে শিল্পায়ন কর্মসংস্থানের যে সঙ্কট তার সমাধান কোথায়?

উঃ পুঁজিবাদের এই মুমূর্ষু স্তরে আঠারো-উনিশ শতকের মতো ব্যাপক শিল্প হতে পারে না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত একটা দুটো শিল্প এখানে সেখানে হতে পারে। এ যুগে শিল্পপতিরা শ্রমিকনির্ভর শিল্প বন্ধ করে যন্ত্রনির্ভর শিল্প গড়ায় খুবই তৎপর। কারণ তাতে পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ে বিপুল হারে, কিন্তু সঙ্কুচিত হয় কাজের সুযোগ। এই যে সমস্যা— এর সমাধান পুঁজিবাদী রাস্তায় নেই। সেজন্যই তো পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রাম। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম। এই কঠিন কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটি বাদ দিয়ে হবে না। কাজেই নির্বাচনে অতীতের মতো যে যতই চাকরির প্রতিশ্রুতি দিক, সেগুলি সবই ভাঁওতা হতে বাধ্য। এইসব ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সামনে যে পুঁজিবাদ পাহাড়প্রমাণ বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে তার বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলনকারী দলকেই ভোট দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। তাদেরই জয়ী করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এসইউসিআই(সি) রাজ্যে ১৯৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

জীবনাবসান

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর নদিয়া জেলার করিমপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড আব্দুস সালাম দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৮ মার্চ কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। নব্বইয়ের দশকে দলের সংস্পর্শে আসেন কমরেড সালাম। প্রথম দিকে অত্যন্ত আবেগে ক্ষুদিরাম নেতাজি প্রভৃতি মনীষীদের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলের কাজ শুরু করেন। প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ ফেল চালুর দাবিতে আন্দোলন, এলাকায় বৃত্তি পরীক্ষা সংগঠিত করা সহ সাধারণ মানুষের বহু সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলা ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় কমরেড আব্দুস সালাম তাঁর স্ত্রী ও পুত্র যাতে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন সেই ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার বহু মানুষ বাড়িতে আসেন। দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড লোহিরউদ্দিন এবং এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক কমরেড মশিকুর রহমান মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড আব্দুস সালামের মৃত্যুতে দল এক নিষ্ঠাবান উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন কর্মীকে হারাল।

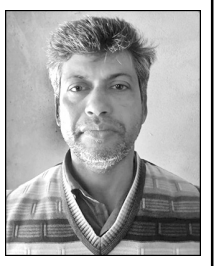

কমরেড আব্দুস সালাম লাল সেলাম

আপনি কীসে জিতবেন

সকালবেলায় মনাদার চায়ের দোকানের বেঞ্চটায় বসতে গিয়ে দেখি পাশেই খবরের কাগজে চোখ রেখে বসে আছেন অসীমবাবু। পাড়াতেই থাকেন। মাঝেমধ্যেই নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আমাকে দেখে বললেন, তরুণবাবু, ভালই হয়েছে আপনার সাথে দেখা হয়ে। আপনি তো খোঁজখবর রাখেন।

বোঝার চেষ্টা করলাম তিনি কীসের খোঁজ করছেন।

বললেন, কী বুঝছেন বলুন দেখি।

কীসের?

কীসের? এখন তো একটাই বিষয়— সরকার কারা গড়বে?

তারপর নিজেই খবরের কাগজটা দেখিয়ে অসীমবাবু বললেন, দেখছেন তো সব। ঘেন্না ধরে গেল মশাই রাজনীতির প্রতি। এর নাম রাজনীতি! ছ্যা, ছ্যা।

ভদ্রলোক কথাগুলো টানা বলে গেলেন। ভেতরে জমা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান বেরিয়ে আসছিল যেন স্রোতের মতো।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমি আর আপনার প্রশ্নের কী উত্তর দেব? উত্তর তো আপনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন।

মনে হল ভদ্রলোক যেন একটু দম নিলেন। বললেন, কিন্তু সরকার তো কেউ না কেউ করবে। আমি জানতে চাইছি সেটা কে?

আমি বললাম, ঠিকই তো। সরকার তো নিশ্চয় কেউ না কেউ করবে। ভোট তো হয় সরকার গড়ার জন্যেই। আপনি বলুন না, আপনি কাকে চাইছেন?

অসীমবাবু যেন একটু থমকে গেলেন। বললেন, আমি?

বললাম, হ্যাঁ, আপনি।

একটু ভেবে নিয়ে বললেন, দেখুন, আমার কথা যদি বলেন, তবে আমি চাই এমন একটা সরকার, যে এইসব নোংরামি করবে না, জিনিসপত্রের দাম কমাবে, বেকার ছেলেমেয়েদের কাজের ব্যবস্থা করবে।

অসীমবাবুর এক ছেলে আর এক মেয়ে। দুজনেই ইউনিভার্সিটি পাশ করে বেকার বসে রয়েছে। বললাম, নোংরামি বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন? ভোটে দাঁড়ানোর জন্য এক দল থেকে রাতারাতি আর এক দলে যোগ দেওয়া, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, বিরোধীপক্ষকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করা, হুমকি দেওয়া— এইগুলো তো?

বললেন, একদম ঠিক। এইগুলোই।

বললাম, আপনিই বলুন না, এ দলগুলোর মধ্যে কে সরকার গড়লে এইসব করবে না?

বললেন, এই তো বেশ মুশকিলে ফেললেন। এদের মধ্যে তেমন কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।

বললাম, তবু আপনি এদেরই কাউকে সরকারে দেখতে চান তো?

অসীমবাবু একটু কাঁচুমাঁচু হয়ে বললেন, উপায় কী বলুন, সরকার তো চাই!

আমি বললাম, কেন? এমন কি কখনও হয়েছে, ভোট হয়েছে অথচ সরকার হয়নি? ফলে সরকার হবেই। আপনি তা নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আপনার সমস্যাটা তো সরকার গড়া নিয়ে নয়। আপনি তো আসলে এমন একটা সরকার চান, যে সরকার স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ একটা প্রশাসন দেবে। আপনার জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবে। আপনার উপর মূল্যবৃদ্ধি কিংবা করের বোঝা চাপিয়ে দেবে না।

বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই।

আমি বললাম, তা হলে এরা কেউই যদি তেমন সরকার দিতে না পারে তবে তো আপনার দায়িত্ব যারা ভোটে লড়ছে তাদের মধ্যে এমন কারও খোঁজ করা, যারা আপনাকে এমন একটা সরকার দিতে পারে।

অসীমবাবু আবার একটু যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনারা কতগুলো প্রার্থী দিয়েছেন?

বললাম, ১৯৬টা। আরও কয়েকটা বাড়তে পারে।

আপনাদের তো জানি। আপনারাই একমাত্র মানুষের জন্য লড়াই করেন। আপনাদের কর্মীরা নিঃস্বার্থে কাজ করেন। কিন্তু আপনারা কি জিততে পারবেন? সরকার গড়তে পারবেন?

দেখুন, অনেকেই এই প্রশ্নটা করেন। অথচ আমি জানি, শুধু আপনি নন, আপনার মতো বেশির ভাগ মানুষই চান একটা স্বচ্ছ সরকার। আপনার মতো তাঁরাও সবাই যদি চান সৎ, নীতিবান, জনস্বার্থে লড়াকু প্রার্থীরা জয়ী হোক, তা হলেই আমার জিততে পারব। আর সরকার গড়ার জন্য তো দরকার ১৪৮ জন বিধায়ক। আমরা তো তার থেকে অনেক বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস জনগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে সত্যটা ঠিক ধরতে পারবে এবং আমাদের সমর্থন করবে।

কিন্তু মিডিয়া তো ওই দু-তিনটে দলকে নিয়েই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে!

ঠিকই তো। ওই দলগুলো যে শ্রেণির স্বার্থে কাজ করে সেই পুঁজিপতিরাই তো এই সব মিডিয়ার মালিক। তারা কেন জনগণের স্বার্থে লড়াই করা একটি দলের প্রচার দিতে যাবে! তারা ওই পেটোয়া দলগুলোর প্রচার দিয়ে, কারা ক'টি আসনে জিতবে তা পর্যন্ত বলে বলে মানুষের মধ্যে ওদের পক্ষে একটা সমর্থন গড়ে তুলছে। কিন্তু কোনও রকম বিচার না করে, শুধু প্রচারের ঢাকের আওয়াজে ভুলে ওই দলগুলোকে সমর্থন করলে দুর্নীতিগ্রস্ত, অসৎ, লোভী, ধান্দাবাজরাই জয়ী হবে, তারাই সরকার গড়বে। কিন্তু তাতে তো আপনার কোনও সুবিধা হবে না! তেমন সরকার তো স্বাধীনতার পর থেকে একটার পর একটা হয়েই চলেছে। তেমন সরকারের অভাব তো রাজ্যে কিংবা দেশে কখনও হয়নি। এ রাজ্যে কখনও কংগ্রেস, কখনও সিপিএম, কখনও তৃণমূল, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি— প্রতিটি ভোটে তারাই কেউ না কেউ জয়ী হয়েছে, আর প্রতিটি ভোটেই আপনি হেরেছেন, আপনার মতো সব সাধারণ মানুষ হেরেছে। সেই একই ভুল কি চলতেই থাকবে?

অসীমবাবু ধীরে ধীরে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আসলে কী জানেন, হেরে যাওয়ার দলে থাকতে কখনও মন চায় না।

— ঠিকই তো পরাজিতের দলে কেন থাকবেন? থাকা উচিত নয় তো। কিন্তু যতবারই আপনি ভেবেছেন আপনি জয়ীর দলে আছেন, ততবারই শেষপর্যন্ত আপনি পরাজিতের দলেই থেকে গেছেন। আপনি আসলে ভেবে উঠতে পারেননি— আসলে কোনটা আপনার জয় আর কোনটা আপনার পরাজয়।

বললাম, মন শক্ত করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, এবার আর পরাজিতের দলে থাকবেন না। শুধু বুঝে নিন, আপনার কাছে কোনটা সত্যিকারের জয় আর কোনটা সতিকারের পরাজয়। যে দলটি সত্যিই আপনার হয়ে লড়াই করছে, তার জয়ই আসলে আপনার জয়, তার শক্তিবৃদ্ধিতেই আপনার শক্তিবৃদ্ধি। তার যদি একজন প্রার্থীও জয়ী হন তবে তিনি একাই এই সব দুষ্টশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থ নিয়ে বিধানসভার ভিতরে বাঘের মতো লড়াই করবেন। অতীতে যেমন সুবোধ ব্যানার্জী করেছিলেন, দেবপ্রসাদ সরকার, তরুণ নস্কর, জয়কৃষ্ণ হালদাররা করেছিলেন। পার্লামেন্টে তরুণ মণ্ডল করেছিলেন।

অসীমবাবু চুপ করে রইলেন। মনে হল কথাগুলো তার এতদিনের চেনা ভাবনাটাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, এমন করে তো কখনও ভাবিনি। আমি বললাম, মনাদা, আর একবার দুটো চা দিন। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

উজ্জ্বলার নামে
আরও এক 'জুমলা'

ঢালাও প্রতিশ্রুতি বিলি করার বেলায় ভোটবাজ দলগুলির নেতানেত্রীদের যে পরিমাণ উৎসাহ-উদ্যম দেখা যায়, সেগুলি বাস্তবায়িত করার বেলায় চোখে পড়ে ততটাই উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা।

প্রথম দফায় সরকারে বসে নরেন্দ্র মোদি বিরাট ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'-র কথা ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলিকে এবার থেকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেবে সরকার। কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়ে রান্না করতে গিয়ে ধোঁয়ার কষ্ট আর পেতে হবে না মহিলাদের। শহর ছেয়ে ফেলা বিজ্ঞাপনের বিশাল বিশাল হোর্ডিং ঝলমল করে উঠেছিল প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানো হাস্যমুখ দরিদ্র মহিলাদের ছবিতে। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ গ্যাসের ভরতুকি ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই সময়। নানা প্রচারমাধ্যমে উজ্জ্বলা যোজনার জোরালো প্রচার করতে গিয়ে খরচও হয়ে গিয়েছিল কয়েকশো কোটি টাকা। কিন্তু 'সাত মণ তেলও পুড়ল, রাধা নাচল না'। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে 'রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ কমপ্যাশনেট ইকনমিক্স'-এর ২০১৮-তে করা একটি সমীক্ষায় বেরিয়ে এল, এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত ১০০টি পরিবারের মধ্যে ৮৫টিই এক সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করার পরেই আবার ফিরে গেছে সাবেক কাঠ কিংবা কয়লার চুল্লিতেই। সিলিন্ডার সরবরাহকারীদের থেকে পাওয়া গেছে এই তথ্য। সংখ্যাটা এতদিনে নিশ্চিতভাবেই আরও বেড়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছে উজ্জ্বলা যোজনা।

কিন্তু গ্যাসের উনুন থাকতেও শ্বাসকষ্ট সহ্য করে জ্বালা করা চোখ জোর করে খুলে রেখে কাঠের আগুনে আবার কেন রান্না করছেন মহিলারা? তাঁরা নিরুপায়। সরকারি দাক্ষিণ্যে গ্যাস মিলেছিল তো ওই একবারই! পরের বার থেকে সিলিন্ডার নিতে হবে নগদ দামে। যোজনা শুরুর সময়ে ২০১৬ সালে গ্যাসের যে সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪২১ টাকার আশপাশে, এখন তার দাম প্রায় ৯০০ টাকা। গত ফেব্রুয়ারিতে তিন দফায় গ্যাসের দাম ১০০ টাকা বেড়েছে। তার আগে দু'দফায় বেড়েছিল ১০০ টাকা। মার্চে বেড়েছে আরও ২৫ টাকা। এসবের আগেই গ্রাহকদের কিচ্ছু না জানিয়ে চুপিসারে কার্যত তুলে দেওয়া হয়েছিল ভরতুকি। এখন গ্যাস নিলে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে ভরতুকির নামে ভিক্ষা দেওয়ার মতো করে ছুঁড়ে দেওয়া ১৯ টাকা ৫৭ পয়সা। বাস্তবে ভরতুকিযুক্ত ও ভরতুকিবিহীন গ্যাস গ্রাহকদের মধ্যে কোনও ফারাকই আজ আর নেই। দু'বেলা পেট ভরা খাবার জোটাতেই যে মানুষগুলির প্রাণান্ত, কোথায় পাবেন তাঁরা সিলিন্ডার নেওয়ার বিপুল টাকা? ফলে কাঠকুটো জোগাড় করে কোনও রকমে দু'মুঠো ফুটিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই উজ্জ্বলা যোজনার মহিলাদের।

এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারির তীব্রতায় বেহাল দশা মানুষের। তার ওপর অতিমারির ধাক্কা সামলাতে প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্র জনদরদ থাকলে একটি সরকারের কী করা উচিত ছিল? উচিত ছিল আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই না পেড়ে পেট্রোপণ্য, বিশেষত উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের জন্য গ্যাসে ভরতুকির ব্যবস্থা করা, নিম্ন আয়ের মানুষকে কিছুটা সুরাহা দেওয়া। কিন্তু দয়ালু নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দেদার ভরতুকির ব্যবস্থা করলেও সাধারণ মানুষের জন্য গ্যাস সহ পেট্রোপণ্যের ওপর থেকে ভরতুকি ছাঁটাইয়ের পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছে।

কিন্তু সামনে যে ভোট! আবার তো ফাঁপা প্রতিশ্রুতিতে ভোলাতে হবে মানুষকে! তাই ফেব্রুয়ারির বাজেটে আবারও বিরাট ঘোষণা মোদি সরকারের। বলা হয়েছে উজ্জ্বলা গ্যাস প্রাপকের সংখ্যা বাড়ানো হবে আরও ১ কোটি! ধন্য ধন্য শুরু করে দিয়েছে ভক্তবৃন্দের দল। সেই ঘোষণা শুনে হয়ত ছেঁড়া আচলে কপালের ঘাম মুছে কুড়ানো কাঠের বোঝাটা শক্ত করে চেপে ধরেছেন সেই মহিলা— হোর্ডিংয়ের বিজ্ঞাপনে যাঁর হাসিমুখ এখনও জ্বলজ্বল করছে নরেন্দ্র মোদির ছবির পাশে।

জমিতে দাঁড়িয়েই চাষি আন্দোলনের ডাক গড়বেতার প্রার্থী তাপস মিশ্রের

আলুর দাম এখন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। অথচ চাষিকে বীজ আলু কিনতে হয়েছিল ৫০০০ টাকা কুইন্টাল দরে। বিঘা প্রতি চাষে খরচ হয়েছে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা। সেখানে বিঘাতে দাম পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। এদিকে লেদা পোকার আক্রমণে আলু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর হঠাৎ কোল্ড স্টোরেজ মালিকরা সেগুলি বন্ধের ঘোষণা করে দিয়েছে। আলু চাষিদের এই মহা বিপদের সময় তাঁদের নিয়ে আন্দোলনের কথা দিয়ে এলেন গড়বেতার এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড তাপস মিশ্র।

তাপস মিশ্র প্রচার করছিলেন আমলাশুলি এলাকার চাষের মাঠে নেমে। চাষিরা তখন আলু তোলায় ব্যস্ত। প্রার্থী সহ কর্মীরা বিস্তীর্ণ মাঠ ঘুরে প্রচার চালান। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দীপক পাত্র ও পার্টির অন্যান্য কর্মীরা। এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলনের ফলে এতদিন চাষিরা ৭০০ থেকে ৯০০ টাকা কুইন্টাল আলুর দাম পাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে কোল্ড স্টোরেজ বন্ধ করে দিয়েছে মালিকরা। অথচ এখনও প্রচুর আলু মাঠেই পড়ে।

তাপস বাবু বলেন, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে আলু চাষিদের নামমাত্র মূল্যে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য করার কৌশল এটি। চাষিদের কাছ থেকে না কিনলেও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আলু নিচ্ছে স্টোর মালিকরা। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে চাষিদের সংগঠিত করে দুর্বার আন্দোলন হবে। লক্ষণীয়, দলের প্রচারে চাষিদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কমরেড তাপস মিশ্র আরও বলেন, আপনাদের নানা সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে। গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি এসইউসিআই (সি) দলকেই নির্বাচনে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে হরিয়ানায় মহাপঞ্চায়েত

১০ মার্চ হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এআইকেকেএমএস-এর আহ্বানে কৃষক-শ্রমিকের মহাপঞ্চায়েত। অন্যান্য কৃষক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান

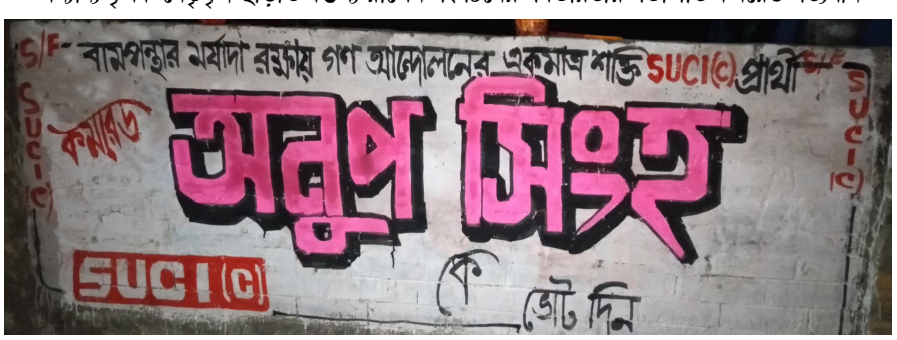

মুর্শিদাবাদের সুতিতে দলের প্রার্থীর প্রচারে দেওয়াল লিখন

আন্দোলন ছাড়া রেলগেটও খোলে না, জীবনের চলার পথ তো নয়ই

বজবজের মানুষের দাবিটা ছিল খুব সামান্য— করোনা লকডাউনের সময় থেকে বন্ধ হয়ে থাকা রেলগেটটি খুলে দেওয়া, আর ভিড় এড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেন চালানো। এইটুকু দাবিতেও কর্ণপাত করার দরকার মনে করেনি কি সরকার কি রেল কর্তৃপক্ষ। আর তথাকথিত বড় বড় দলগুলির সাংসদ, বিধায়ক সহ তাবড় সব নেতারা, যাঁরা এখন ভোটের বাজারে জাঁকজমকের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, তাঁরা? না, জনজীবনের দাবি তুলে ধরার দায় তাঁদের নেই। তাঁরা ভাবেন ভোটের আগে কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আর কিছু টাকার বান্ডিল ছুঁড়লেই যখন ভোট হয়ে যায়, মানুষকে অধিকার আদায়ের পথ তাঁরা দেখাতে যাবেন কেন? সেই কোনকালে রমাপদ চৌধুরীর কলমে ফুটে উঠেছিল মানুষের মর্যাদাবোধ কেড়ে নেওয়ার জন্য শাসকের চক্রান্তের ছবি। সেখানে শুধু ক'টা সিদ্ধ ডিম ছুঁড়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা আদিবাসী গ্রামকে 'ভিখারি'তে পরিণত করেছিল ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনারা। এ কালের ভোটবাজ নেতাদের দেখলে গল্পকার হয়ত মানুষের মর্যাদা হরণের এক নতুন কথা জানতেন!

এর ঠিক বিপরীতে মর্যাদা নিয়ে মানুষকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ দেখানোর রাজনীতির ধারাটা নিয়ে এসেছে মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। তাই বজবজের মানুষের এই দাবি নিয়ে এলাকার অটোচালক, দোকানদার, রেলযাত্রী, জুটমিল শ্রমিক, তেল কোম্পানির শ্রমিক সকলকে যুক্ত করে গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিল এই দল। অধিকার আদায়ের সেই কথাই শোনা গেল ১৯ মার্চ বজবজ স্টেশনে বসে থাকা এক তরুণীর মুখে। প্রচার চলছিল বজবজ কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী উত্তম পাল এবং সাতগাছিয়া কেন্দ্রের প্রার্থী সেখ রবিয়ালের সমর্থনে। প্রচারে যাওয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দেখিয়ে বেঞ্চে বসে থাকা চার-পাঁচজন সঙ্গীর উদ্দেশে কী যেন বলছিলেন ওই তরুণী। একজন কর্মী এগিয়ে গিয়ে লিফলেট দিতেই বললেন, 'ওদের বলছিলাম, এই দলটার জন্যই রেলগেটটা খুলেছে, ট্রেনও অনেকগুলো বেড়েছে'। দলের এক বর্ষীয়ান সংগঠক কিন্তু কৃতিত্বটা দিলেন সেই তরুণীকেই আর এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, অটোচালক দোকানদার, শ্রমিক, রেলযাত্রীদের। বললেন, 'আপনারা যদি গণকমিটিতে এগিয়ে না আসতেন, নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার ডাকে সাড়া না দিতেন, শুধু আমাদের কিছু দলীয় কর্মীর পক্ষে আন্দোলনটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত কি'? অনুরোধ করলেন, 'সকলকে বলবেন, ভোটটাকেও এই অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মতো করেই যেন দেখেন তাঁরা। আন্দোলন ছাড়া রেলগেটও খোলে না, জীবনের চলার পথও কেউ খুলে দেয় না'। উজ্জ্বল চোখে একটু হেসে তরুণীটি বলে গেলেন, আন্দোলনের এই শক্তির পাশেই থাকবেন তিনি। বজবজের এক মধ্যবয়সী পুরনো বামপন্থী কর্মী লিফলেট চেয়ে নিলেন। তাঁর আক্ষেপ, আমাদের দলটা ভোটের স্বার্থে যে জায়গায় নামল, ভাবতেও লজ্জা হয়। আপনাদের দেখলে বুকে বল পাই। নিজের নাম ফোন নম্বর দিয়ে বলে গেলেন, স্ক্রুটিনি হয়ে গেলেই চিহ্নটা জানাবেন, ভোটটা আপনাদেরই প্রাপ্য।

স্টেশনের আশেপাশের বাড়িতে মানুষের নানা ক্ষোভের কথা শুনে এসে অন্যদের তা বলছিলেন দলের দুই কর্মী। এগিয়ে এলেন এক জুট মিলের শ্রমিক। '২৫ বছর সিপিএম করেছি। আজ নেতারা কংগ্রেস আর আব্বাসের হাত ধরেছেন!' পকেট থেকে বার করলেন ৫০ টাকার একটা নোট, বললেন, 'এটা রাখুন। লড়াইয়ে আমার এই সাহায্যটুকু রইল। পারলে আরও দিতাম'। বারবার অনুরোধ করে গেলেন তাঁর বাড়িতে যেতে, অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

বজবজের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সমস্যা, বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিদের সেচের সমস্যা, চড়িয়াল খাল সংস্কার না হওয়ার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এস ইউ সি আই (সি)। একই সাথে রায়পুরের টালি শ্রমিকদের দাবি, মৎস্যজীবীদের সমস্যা, জলপ্রকল্পের ড্রেনেজের জলে চাষের জমিতে দূষণের সমস্যা এগুলি নিয়ে নানা সময় আন্দোলন গড়ে তুলেছে দল। এলাকায় শিক্ষা আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকেছেন দলের প্রার্থী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। আবার সিপিএম আমলের মতোই তৃণমূল আমলেও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এই দলই। সব মিলিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গের মতোই বজবজ, সাতগাছিয়া এলাকায় আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। ভোটের সময়েও উঠে আসছে সেই আন্দোলনের কথা। নির্বাচনকেও আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে দেখার সংগ্রামী লাইনই তুলে ধরছে এসইউসিআই(সি)

বজবজের প্রার্থী কমরেড উত্তম পাল ও সাতগাছিয়ার প্রার্থী কমরেড সেখ রবিয়াল বজবজ স্টেশনে যাত্রীদের সাথে কথা বলছেন

কেমন ‘সোনার আসাম’ গড়েছে বিজেপি

রাজ্যে রাজ্যে নাকি ‘সোনা’ ফলিয়েছে বিজেপি! এবার বাংলাকে সোনায় মুড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা। গত পাঁচ বছরে ক্ষমতায় থেকে আসামকে তারা কোন ‘সোনায়’ মুড়ে দিয়েছে দেখা যাক।

বেকারি ভয়াবহ

আসামে বেকারির হার ২৫ শতাংশ। আগের মাসের তুলনায় শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই বেকারি বেড়েছে ১.৮ শতাংশ (জি প্লাস নিউজ, ৫ নভেম্বর ২০২০)। অতিমারিতে কয়েক কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। অতিমারির আগেই আসামে শিক্ষিত নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ (টাইমস অফ ইন্ডিয়া- ১ আগস্ট, ২০১৯)। নথিভুক্ত নয় কিন্তু শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বেকার ধরলে সংখ্যাটা কোটি ছাড়িয়ে যাবে। গড় আয় ১৫ শতাংশ কমে গেছে। দারিদ্র্যের অনুপাত বেড়ে

পৌঁছেছে ৫০.৮ শতাংশে।

৬৯ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভুগছেন

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭২ শতাংশ অন্তঃসত্ত্বা এবং ৬৯ শতাংশ সাধারণ মহিলা রক্তাল্পতায় ভুগছেন। মা ও শিশুর পুষ্টির অভাবে ৩৬ শতাংশ শিশু খর্বাকার। শিশুমৃত্যুর হার এবং অপুষ্টির হার ক্রমশই বেড়ে চলেছে আসামে। প্রয়োজনীয় ক্যালরিযুক্ত খাবারের অভাবে ভুগছে আসামের ৫৯ শতাংশ গ্রামীণ এবং ৫২ শতাংশ শহুরে পরিবারের সদস্যরা (এনএসএসও রিপোর্ট, ৬৬ রাউন্ড)। মিড ডে মিল প্রকল্পের মাধ্যমে কিছুটা সুরাহা হত। সেই প্রকল্পকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চলেছে বিজেপি সরকার।

আসাম বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম চা প্রস্তুতকারক। আসামের চা-বাগানগুলিতে লক্ষাধিক নারী-শ্রমিক কাজ করেন। তাদের বাসস্থান এবং কাজের পরিবেশ শোচনীয়। এখানকার শ্রমিক পরিবারে বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু আকছার ঘটে। শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় দেশের মধ্যে শীর্ষে আসাম। রক্তাল্পতা, অপুষ্টির কারণে ও চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে চা শ্রমিকরা দুর্দশাগ্রস্ত। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিতে খাটিয়ে নেওয়া হয়। ফলে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির বাজারে পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর দুরবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়।

সরকারের স্তরে স্তরে দুর্নীতি

বিজেপি ক্ষমতায় এসে বলেছিল, তারা দুর্নীতিমুক্ত, দূষণমুক্ত এবং মিলিটারি মুক্ত প্রশাসন গড়বে। সরকারি অফিসারদের ‘দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স’ নিয়ে চলার কথা ঘোষণা করেছিল। অথচ দুর্নীতি আজ সর্বব্যাপক। ২০১৭ সালে ‘ঘুষ দিয়ে চাকরি’ দুর্নীতিতে প্রশাসনের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত ছিল। এছাড়াও অসংখ্য দুর্নীতি হয়েছে, যাতে জড়িত সরকারি কর্তা থেকে শুরু করে নেতা-মন্ত্রীরা।

কংগ্রেস আমলে তো বটেই, বিজেপি আমলেও আসামে বন্যা কবলিত এলাকাগুলির কোনও উন্নতি হয়নি। ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় ২১টি জেলার ২২.৫ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হন, মারা যান ৯৯ জন। ২০২০ সালেও ব্রহ্মপুত্র নদীর জলস্ফীতির কারণে ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয় গোটা রাজ্য। দায়সারাভাবে কিছু ত্রাণ ঘোষণা করেই দায়িত্ব সেরেছে বিজেপি সরকার। স্থায়ী সমাধানের কোনও চেষ্টা করেনি। অথচ বছর বছর বরাদ্দ সরকারি তহবিলের টাকা নিয়ে চলে চুরি-দুর্নীতি। নির্বাচনের সময় নেতাদের বন্যা মোকাবিলার প্রতিশ্রুতিই সম্বল সাধারণ মানুষের।

নারীদের উপর অত্যাচারে শীর্ষে

সশস্ত্র সেনাবাহিনীর হাতে মহিলাদের অত্যাচারের ঘটনায় শীর্ষে আসাম। কংগ্রেসের গত ১৫ বছর এবং বিজেপির ৫ বছরের শাসনে এই শীর্ষস্থান কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি এবং নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচার ওখানকার মহিলাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে (হিন্দুস্তান টাইমস-১ নভেম্বর, ২০২০)।

ছাঁটাইয়ের খড়্গ শিল্পে, চাষিরাও বিপাকে

রাজ্যের মোট শ্রমিকের ৭৫ শতাংশ স্বনিযুক্ত অথবা চুক্তিভিত্তিক ঠিকা শ্রমিক। এছাড়া ২৫ শতাংশ স্থায়ী, ৪৯ শতাংশ অস্থায়ী শ্রমিক। জনবিরোধী ছাঁটাই আইন প্রয়োগ করে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় যখন তখন। কোনও নোটিশ ছাড়াই হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। সরকার কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় শ্রমিক পরিবারগুলি অনাহারে-অর্ধাহারে কাটাতে বাধ্য হয়। ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার রাজ্যে রাজ্যে উন্নয়নের গল্প শোনালেও রাজ্যের কৃষিতে উন্নয়ন করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টে কর্পোরেট মালিকদের হাতে কৃষি ক্ষেত্রকে তুলে দেওয়ায় কৃষকরা ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে, ঋণের বোঝা বইতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন।

নাগরিকত্ব সমস্যা সমাধানের কথা মুখেও আনছে না বিজেপি

এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ) এনে দেশের সমস্ত মানুষকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে বলে ধুয়ো তুলেছিল বিজেপি। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড সহ নানা পরিচয়পত্র নাগরিক হিসেবে থাকা সত্ত্বেও তাদের বিদেশি তকমা দিতে শুরু করে বিজেপি। বিজেপি শাসিত আসাম ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছে ১৯ লক্ষ নাগরিককে, যার মধ্যে ১৫ লক্ষের বেশি হিন্দু। এই বিজেপি সোনার বাংলা গড়বে? এর থেকে বড় ভাঁওতা আর কী আছে!

বিজেপির ‘সুশাসন’-এর কয়েকটি নমুনা

সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও বৈষম্য

- অক্সফ্যামের রিপোর্ট অনুযায়ী, লকডাউনের মধ্যে ভারতীয় ধনকুবেরদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ।
- গত এক বছরে অতিমারি পরিস্থিতিতেও ভারতের সবচেয়ে ধনী ১০০ জনের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২২ কোটি টাকা। এই টাকা ভারতের দরিদ্রতম ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিলে প্রত্যেকে পেতেন ৯৪ হাজার ৪৫ টাকা।
- অতিমারির সময়কালে ভারতের ১১ জন সর্বোচ্চ ধনীর সম্পদ যে পরিমাণ বেড়েছে, তার ওপরে মাত্র ১ শতাংশ কর বসানো গেলে সেই টাকায় দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে কম দামে ওষুধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি জনঔষধি প্রকল্পের বরাদ্দ ১৪০ গুণ বাড়ানো যেত (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৫-০১-২১)।
- ২০২০-র মার্চ থেকে অক্টোবরের ভিতরে মুকেশ আম্বানির সম্পদ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৫০ কোটিতে পৌঁছেছে এবং তিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনীদের তালিকার ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছে গেছেন। আগের বছর তিনি ছিলেন ২১তম স্থানে। অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে, অতিমারি সময়কালে আম্বানি সাহেবের সম্পদ মাত্র চার দিনে গড়ে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা গোটা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কর্মচারীর বার্ষিক বেতনের যোগফলের চেয়েও বেশি (ইউসিএনিউজ.কম, ১-২-২১)।
- আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (আইএলও)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, অতিমারির সময়ে মুকেশ আম্বানির সম্পদ যে পরিমাণে বেড়েছে তা দিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৪০ কোটি শ্রমিককে অন্তত ৫ মাসের জন্য দারিদ্র্যমুক্ত করা যায় (ইউএনএমআইডি.কম, ২৫-১-২১)।
- ২০২০-র শেষে শিল্পপতি গৌতম আদানির সম্পদ আগের বছরের ৮৪ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা থেকে তিন গুণ বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকা (ইকনমিক টাইমস, ১৪-১২-২১)।

বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা

- সংসদে ১ জুলাই ২০১৯ এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, দেশে ৬ লক্ষ ৮০ হাজারের মতো কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা দেশের মোট রেজিস্ট্রিভুক্ত কোম্পানির ৩৬.০৭ শতাংশ (ইকনমিক টাইমস, ১-৭-১৯)।
- লকডাউনের মধ্যে দেশের আরও ২ লক্ষ ৭০ হাজার বড় কারখানা এবং ৬ থেকে ৭ কোটি ছোট ও কুটির শিল্পের কারখানায় তালা পড়েছে (ইউএনএমআইডি.কম, ২৫-১-২১)।

কর্মহীন ও কাজ হারানো শ্রমিকের সংখ্যা

- সিএমআইই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের শহরগুলিতে বেকারত্বের হার বর্তমানে প্রায় ৩১ শতাংশ। বেকারত্বের সামগ্রিক হারও বেড়ে গিয়ে ২৩.৪ শতাংশে পৌঁছেছে (লাইভমিন্ট ৭-৪-২০)।
- ৯ কোটি দিনমজুর এবং প্রায় ২ কোটি বেতনভুক কর্মচারী সহ ১২ কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে এবং ৮৪ শতাংশ পরিবারের আয় কমে গেছে (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৬-৫ এবং এনডিটিভি ২৮-৫-২০)।

ঋণের পরিমাণ

- ভারতের মোট ঋণের পরিমাণ ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার ২৬৮ কোটি। প্রতি বছর সুদ বাবদ খরচ হয় ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রতিটি নাগরিকের মাথার ওপর রয়েছে ৬৫ হাজার ২৮৫ টাকা ঋণের বোঝা (কমোডিটি.কম, ১৮-২-২১)।
- ২০১৯-২০ সালের তুলনায় ২০২১-২২-এ সুদের পরিমাণ ১৫ শতাংশ বেশি। এই বছরে আদায় হওয়া মোট রাজস্বের ৪৫ শতাংশই সুদ দিতে খরচ হবে (পিআরএসইন্ডিয়া.ওআরজি)।

(চলবে)

বাঙ্গালোরে শ্রমজীবীদের সমাবেশ

১৫ মার্চ কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশাকর্মী ইউনিয়নের ডাকে হাজার হাজার আশাকর্মী তাঁদের নানা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান

পাঠকের মতামত

সুবিধাবাদ

দলের জন্মলগ্ন থেকেই সিপিআই এবং তার থেকে উদ্ভূত সিপিএম নেতৃত্ব মার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতি, জীবনসংগ্রাম আয়ত্ত করতে না পারায় দুটি দলই সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলে পর্যবসিত হয়েছে। এই দলগুলো মুখে বামপন্থার কথা বলে, বিপ্লবের কথা বলে, সমাজতন্ত্রের কথা বলে, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে, ভোটের সময় শ্রমিক শ্রেণির প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি ও লাল ঝান্ডা ব্যবহার করে, অথচ আচরণ করে দক্ষিণপন্থী ভোটসর্বস্ব বুর্জোয়া দলগুলোর মতো। যে কোনওভাবে ভোটে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চর্চা করে। নেতাদের ব্যক্তিজীবনে মার্কসবাদের চর্চা নেই, ফলে কর্মীদের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেনি। রাজনৈতিক স্বার্থে দরিদ্র অসহায় শ্রমিক-কৃষকদের তারা বিভ্রান্ত করে মেকি বামপন্থার মুখোশ পরে। আসলে কমিউনিস্ট লেবেল লাগিয়ে বামপন্থাবিরোধী আচরণ করছে আমাদের দেশের সিপিআই, সিপিএমের মতো তথাকথিত বামপন্থী দলগুলো।

সিপিএম কেরালায় মুসলিম লিগের সাথে যেমন যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করেছে তেমনি আবার ১৯৭৭-৭৯ সালে কেন্দ্রে জনসংঘের সঙ্গেও রাজনৈতিক আঁতাত করেছে তারা। বর্তমানে বাংলা ও আসামে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলকে নিয়ে জোট গঠন করছে ক্ষমতায় যাওয়ার আশায়। পশ্চিমবঙ্গে টানা ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার। সেই সময় পুলিশ বাহিনী ও দলীয় মাস্তান দিয়ে গণআন্দোলনকে ধ্বংস করেছে ক্ষমতার দম্ভে। আজ তারা কেরালায় ক্ষমতায় থাকার আশায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং স্লোগান তুলছে পুঁজিবাদের দালাল কংগ্রেস হটাও, কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও। পশ্চিমবঙ্গে তার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করছে। যে কংগ্রেসকে তারা 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে অভিহিত করছে সেই কংগ্রেস ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গার হোতা, বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছে। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবে বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেন। তিনিই বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে বাবরি মসজিদের পাশে রামমন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি দেন।

শুধু কংগ্রেস নয়, সিপিএমের জোটসঙ্গী ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি যে নতুন দল গঠন করেছেন (আইএসএফ) ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট তাও একটা সাম্প্রদায়িক দল। আব্বাস সিদ্দিকী মুখে মুসলিম বঞ্চনার কথা বলে ধর্মীয় উত্তেজক কিছু বক্তব্য রাখেন এবং মুসলমানদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে এই দল গঠন করেছেন। এটি সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক দল। এই আব্বাস সিদ্দিকী দল গঠনের পূর্বে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির 'মিম'-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এখানে জোটবদ্ধ হয়েছেন। মিম বিহার নির্বাচনে মুসলিম হাওয়া তুলে বিজেপির পক্ষে ধর্মীয় মেরুকরণের সুযোগ করে দিয়েছিল। যাঁরা বামপন্থাকে ভালোবাসেন, সিপিএম নেতৃত্বের এই সুবিধাবাদী আচরণে তাঁরা হতাশ ও বিভ্রান্ত।

আজ সিপিএম, সিপিআই-এর উচিত ছিল, করোনা পরবর্তী সময় যখন কোটি কোটি লোক কাজ হারিয়েছে, পেট্রল-ডিজেলের মূল্য প্রতি দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ হচ্ছে এর প্রতিবাদে সমস্ত বামপন্থী দলগুলোকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা। দিল্লিতে যে ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ চলছে সমস্ত বামপন্থী দল মিলিত হয়ে সংগঠিত আন্দোলন করলে কৃষক আন্দোলন নতুন মাত্রা পেত। তাহলে যথার্থ বামপন্থাকে শক্তিশালী করা হত এবং বামপন্থার শক্তি বৃদ্ধি পেত মানুষের আস্থা ফিরত ঐক্যবদ্ধ বামপন্থীদের লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই নীতিহীন, আদর্শহীন, ভোটসর্বস্ব জোটকে গণতন্ত্রপ্রিয় পশ্চিমবাংলার মানুষ বিশ্বাসের চোখে দেখবে না। সিপিএম অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কার্যকলাপকে 'ভুল' বলে কবুল করেছে। অথচ অ-বাম নীতি শুধরানোর চেষ্টা করেনি। এবার যে ভুল তারা করতে চলেছে তাতে মানুষ তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে পাঠালে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ সিপিএম আর পাবে কি?

শ্যামল দত্ত, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

সিপিএমের 'ধর্মনিরপেক্ষ' জোট

আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস ও আব্বাস সিদ্দিকিকে নিয়ে জোট তৈরি করেছে সিপিএম। ২৮ ফেব্রুয়ারি 'ঐতিহাসিক' ব্রিগেড সমাবেশও তারা করল। তারাও পিছিয়ে নেই— এই বার্তা দিতে বিজেপিও ব্রিগেডে সভা করল। আমি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাই এই লেখাটি বামেদের কেন্দ্র করেই।

অবাক হলাম সিপিএমের দলীয় প্রচারে শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং সলিল চৌধুরীর গণসংগীত ব্যবহৃত না হয়ে টুম্পা সোনা গানের প্যারডি ব্যাবহার এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু যুবক-যুবতীর অঙ্গভঙ্গি দেখে। তারপর দেখছি, কয়েকটা সিট পেতে কংগ্রেস এবং এক ধর্মীয় মৌলবাদীকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'গণতান্ত্রিক' বানিয়ে দিল তারা। প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেস কি কখনও ধর্মনিরপেক্ষ ছিল? তাদের আমলে গণতন্ত্র ছিল? রাজনীতিতে আসার আগে আব্বাসের কিছু বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি কেমন ধর্মনিরপেক্ষ এবং মহিলাদের প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন! সিপিএমের বক্তব্য, ব্রিগেডের সভায় আব্বাস সাম্প্রদায়িক কোনও কথা বলেননি এবং তাঁর দলে অনেক হিন্দু ও আদিবাসী মানুষ আছেন। অতএব, তিনি ও তাঁর দল নাকি ধর্মনিরপেক্ষ! বিজেপি দলটির মধ্যেও কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। তাহলে, সিপিএমের যুক্তি অনুযায়ী কি এটা বলা যায় যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়? সিপিএম বলছে বিকল্প একটি ফ্রন্টে আব্বাসের আইএসএফ-কে যুক্ত করা নাকি সময়ের দাবি! অথচ বাম ঐক্য গড়ে তুলে দেশ ও রাজ্য জুড়ে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বেকারত্বের প্রতিবাদে, নারী সুরক্ষার দাবিতে, ছাত্র বিরোধী নীতির প্রতিবাদে, বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে, মদ বন্ধ এবং কালা কৃষি ও নতুন শ্রম আইন বাতিলের দাবিতে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তাদের কাছে সময়ের দাবি নয়! সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে আটকাতে তারা আরেকটি সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত ধরছেন তাঁরা! একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা উঁচু করলে অপরটিও যে মাথা উঁচু করে, এটা তাঁরা বুঝছেন না। এর ফল তো রাজ্যের মানুষকেই ভুগতে হবে!

অনির্বাণ দাস দাস, হালতু, কলকাতা

কাতারে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন শ্রমিকরা

হেলদোল নেই কোনও সরকারেরই

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ কাতার। বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের ভাণ্ডার রয়েছে উপসাগরীয় এই দেশটির মাটির নিচে। প্রতি বছর বেকার সমস্যায় জেরবার জনবহুল দেশগুলি থেকে দলে দলে শ্রমিক পাড়ি দেন কাতারে— রোজগারের খোঁজে। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত হয়েছে এক ভয়ঙ্কর তথ্য। 'মিডল ইস্ট আই'-এর রিপোর্ট উল্লেখ করে সেখানে বলা হয়েছে, কাতারে ২০১০ থেকে '২০— এই দশ বছরে মারা গেছেন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা আর নেপাল থেকে কাজ করতে যাওয়া ৬৭৫০ জন শ্রমিক। আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের মৃত শ্রমিকদের সংখ্যা এতে ধরা হয়নি।

২০২২-এ ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কাতারে। সেই উপলক্ষে সেখানে নানা ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দলে দলে কাতারে গেছেন এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ ঠিকা শ্রমিক। রোজগারের আশায় পরিবার-পরিজন ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে কাতারে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজে যোগ দেন এঁরা। কাতার সরকারের দায়িত্ব, দেশে কাজ করতে আসা এই শ্রমিকদের শ্রম-অধিকার ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে কিনা, বিদেশে এসে তাঁরা কোনও রকম সমস্যায় পড়ছেন কিনা, তা দেখা। অথচ পরিযায়ী শ্রমিকদের এত বেশি সংখ্যায় মৃত্যু দেখিয়ে দিচ্ছে, কাতার সরকারের চোখে তাঁদের জীবন নেহাতই মূল্যহীন।

এ নিয়ে বহু বার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অনেক শ্রমিক সংগঠন ও মানবাধিকার সংস্থা। কাতার সরকারের কাছে বারবার এই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, অসুস্থ হলে চিকিৎসা পাওয়া ও কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। দাবি উঠেছে, শ্রমিকের আইনসঙ্গত অধিকারগুলি হরণ করছে যারা, সেইসব মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। কিন্তু কাতার সরকার কর্ণপাত করেনি। সে দেশে দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা 'কাফালা ব্যবস্থা'য় এই সেদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের দাস শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হত। বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ ওঠায় ২০২০-র সেপ্টেম্বরে কাতার সরকার কাফালা ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু কম মজুরি, কাজের দীর্ঘ সময়, মজুরি দিতে দেরি, কাজের অসুরক্ষিত পরিবেশ ইত্যাদি যে সমস্যাগুলি শ্রমিকদের, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, সে ব্যাপারে কাতার সরকার মাথা ঘামাতে রাজি নয়।

শ্রমিকদের মৃত্যু নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে কাতার সরকারের চূড়ান্ত অনীহার কথা বলা হয়েছে এই রিপোর্টে। শুধু তাই নয়, মালিকের অবহেলায় যথাযথ সুরক্ষা না থাকা বা কাজের দুর্বিষহ পরিবেশের কারণে হওয়া এই মৃত্যুগুলিকে 'স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু' বলে উল্লেখ করেছে কাতার প্রশাসন। মৃতদেহগুলির যথাযথ ময়নাতদন্ত না করে মৃত্যুর কারণ এমনভাবে দেখাচ্ছে যাতে আইনের প্যাঁচে পড়তে না হয়। কাতারে গ্রীষ্মকালের অত্যন্ত চড়া তাপমাত্রায় খোলা জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বহু শ্রমিকের। এ ব্যাপারে আইএলও সহ শ্রমিক-সংগঠনগুলি বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সরকারের হেলদোল নেই। ফলে নিয়োগকারী ঠিকাদাররাও অবাধে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করে বিদেশ থেকে আসা শ্রমিকদের। শ্রমিক-মৃত্যু নিয়ে কাতার সরকারের এই অস্বচ্ছতা ও উদাসীনতার নিন্দা করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও।

পরিযায়ী শ্রমিকরা যে দেশের নাগরিক, বিদেশে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের জীবনের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা— তা দেখার দায়িত্ব শ্রমিকরা যে দেশের নাগরিক, সেখানকার সরকারেরও। কাতারে শ্রমিকদের এই মর্মান্তিক মৃত্যু প্রমাণ করছে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা নেপাল সরকারের মতো ভারত সরকারও বিদেশে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের ভাল-মন্দের বিষয়ে নিতান্তই উদাসীন।

অথচ এই শ্রমিকরাই প্রতিটি রাষ্ট্রের স্তম্ভস্বরূপ। এদের অমানুষিক পরিশ্রমের ওপরেই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা সভ্যতা। এরাই গড়ে তোলে ধনকুবেরদের প্রাসাদ, ভরে তোলে মুনাফার সিন্দুক। কাতারে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি সেখানকার সরকারের এই অমানবিক আচরণ আরও একবার দেখিয়ে দিল, পুঁজিবাদী দেশের সরকার আজ গরিব মেহনতি মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও দিতে রাজি নয়।

(তথ্যসূত্র ঃ পিপলস ডিসপ্যাচ)

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ

একের পাতার পর

'রিপোর্ট অন কারেন্সি অ্যান্ড ফাইনান্স' থেকে জানা যায়, স্বাধীনতার সময় ভারতে কোনও সরকারি ব্যাঙ্ক ছিল না। ছিল ৬৩৮টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক এবং ৩৯৫টি সমবায় ব্যাঙ্ক। স্বাধীনতার পর প্রথম আট বছরে সব মিলিয়ে ৩৬১টি ব্যাঙ্ক ফেল করে। এর ফলে আমানতকারীরা সর্বস্বান্ত হন, ব্যাঙ্ককর্মচারীরা কর্মচ্যুত হন। ১৯৫৫ সালে সর্ববৃহৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে জাতীয়করণ করা হয়, নামকরণ হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি বড় বড় পুঁজিপতিদের মালিকানায় পরিচালিত হত। ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ তারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করত। গ্রামের কৃষক, শহরের ছোট ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্তদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৯, এই ১৭ বছরে সারা দেশে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ৪ হাজার থেকে বেড়ে হয় ৮ হাজার। ১৯৬৯ সালে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, যার ফলে ১৯৭৫-এর মধ্যে ১০ হাজারের বেশি ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়। এই শাখাগুলির বেশিরভাগ ছিল গ্রামীণ শাখা। ১৯৮০-তে আরও ৬টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় ১৯৯০ সালের মধ্যে সারা দেশে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ৫৯ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩৪ হাজারের বেশি গ্রামীণ শাখা। গ্রামীণ জীবনের যতটুকু আর্থিক বিকাশ হয়েছে সেখানে এই ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২০০৭-০৮ অর্থবর্ষে বিশ্বজুড়ে যে আর্থিক সঙ্কট এসেছিল তার কারণ ছিল বিভিন্ন বহুজাতিক বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক বাজারে ফাটকাবাজি এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ঋণ নিয়ে বেপরোয়া কারসাজি। এই ধরনের বল্গাহীন, ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ ভারতের অর্থনীতিকে ততখানি গ্রাস করেনি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আধিপত্যের কারণে। আজ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাকে ভেঙে ভারতকে সেই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থার সামনে ঠেলে দিচ্ছে মোদি সরকার। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদের এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থকে বিপন্ন করবে, তেমনি দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে দেবে। গত ৩০ বছরে যতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল করেছে তার প্রত্যেকটাই বেসরকারি। গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ক, কারাড জনতা সহকারী ব্যাঙ্ক— এগুলি প্রত্যেকটিই বেসরকারি ব্যাঙ্ক। এগুলি সব ফেল করেছে। এর মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেষোক্ত ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করেছে। বেসরকারি গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স। রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোটা অঙ্কের মূলধনের টাকা (৭,২৫০ কোটি টাকা) জোগান দিয়ে ইয়েস ব্যাঙ্ককে বাঁচাচ্ছে। 'ভোকাল ফর লোকাল' বলতে বলতে লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে তাকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে সিঙ্গাপুরের ডি বি এস ব্যাঙ্কের সাথে। বেসরকারিকরণ করে এই বিপদ ডেকে আনা কী উদ্দেশ্যে?

বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বড় সমস্যা হল বিশাল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ মোদি সরকারের এই ৬ বছরে নতুন অনুৎপাদক সম্পদ বেড়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৫.৭১ লক্ষ কোটি টাকা। আর ৬.৭৮ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ 'রাইট অফ' করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ খাতা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। এনপিএ'র এত বড়ঝাপটা সয়েও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ধারাবাহিক লাভের মুখদেখছে। ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে যেখানে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মোট অপারেটিং প্রফিটের পরিমাণ ছিল ৭৬ হাজার ৯৪৫কোটি টাকা, সেটা বাড়তে বাড়তে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এসে দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে বর্তমান নীতির মাধ্যমে দুর্বল করতেই বেশি আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার।

গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মোট অনুৎপাদক সম্পদের ৭৩ শতাংশই কর্পোরেট সংস্থাগুলি নেওয়া ঋণ শোধ না করার কারণে এবং এই বিপজ্জনক ঋণগুলো অনেকটাই সরকারের উপরমহল থেকে নির্দেশ আসে বলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ শাসক দলের প্রভাবশালীরা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে বড় বড় পুঁজিপতিদেরকে বিপুল ঋণ পাইয়ে দেয়, যা তারা শোধ করে না। ঋণ শোধ না করার জন্যই ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হচ্ছে, সেই দুর্বলতা দেখিয়ে তাদের হাতেই ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে দিচ্ছে মোদি সরকার। এ যেন বিড়ালকেই মাছ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া।

এর ফল কী হবে? জনগণের এই সঞ্চয় নিয়ে শিল্পপতিরা নিজেদের ব্যাবসায় খাটাবে। তাদের ব্যবসা কোনওভাবে মার খেলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ও মার খাবে। এফআরডিআই বিল অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেলেও সরকারের কোনও দায়িত্ব থাকবে না আমানতকারীর টাকা ফেরত দেওয়ার। রাষ্ট্রায়ত্ত হলে সরকারের কিছু দায়িত্ব থাকতই, বেসরকারি হলে সেটুকুও আর থাকবে না। বর্তমানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জমা টাকা বা আমানতের মোট পরিমাণ ১২৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এর ৭০ শতাংশ সাধারণ মানুষের। ফলে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ হলে শুধু ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বিপদ বাড়বে না, দেশের সাধারণ মানুষও হারাবেন তাদের গচ্ছিত টাকা। তাই একে যে কোনও মূল্যে রুখতে হবে। পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্র কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা টাকা ফেরতের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মঘট চলাকালীন অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্ককর্মচারীদের বিভ্রান্ত করতে বলেন যে, 'সব ব্যাঙ্ক তো আর বেসরকারি হয়ে যাচ্ছে না। তবে যেগুলি বেসরকারি হচ্ছে, সেখানে কর্মীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত রাখা হবে যে কোনও মূল্যে।' মন্ত্রীদের এসব কথার কোনও মূল্য আছে কি? আগুনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বলছে কি না বাঁচাব! ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা স্পষ্ট বলছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের নীতির বিরোধী তারা। সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা এই মুহূর্তের বড় প্রশ্ন নয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা বলছেন, স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্ত করার সময় সরকার বলেছিল, কর্মীদের স্বার্থ দেখা হবে। কিন্তু সংযুক্ত হওয়ার পর কিছু শাখা বন্ধ করে দেওয়া হল, আনা হল ভিআরএস। সম্প্রতি সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে ৪টিতে রূপান্তরিত করার পর দেখা যাচ্ছে কিছু শাখার অবলুপ্তি ঘটাতে সক্রিয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে এরপর নিয়োগ বন্ধ, ভিআরএসের মাধ্যমে কর্মী ছাঁটাই তো শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে ব্যাঙ্ককর্মীদের কাছে দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই।

রেল 'ডাকাতি'

বিষ্ণুপুরের এক বাসিন্দা কলকাতা যাচ্ছিলেন, গঙ্গায় মায়ের চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে। এর জন্য লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটেন। খড়গপুরে এসে চিরাচরিত গোমো প্যাসেঞ্জার ধরেন তিনি। মেদিনীপুর পেরোনোর পরে টিকিট পরীক্ষক টিকিট চেক করার নামে ফাইন করেন ২০০ টাকা, লোকাল টিকিটে এক্সপ্রেসে যাওয়ার অপরাধে। তিনি বলেন এটা তো লোকাল, এক্সপ্রেস কেন? আর যদি এক্সপ্রেস হয় তবে রেল লোকাল টিকিট দিল কেন? রেলযাত্রী তুষার মেটে, দীপক পাত্ররাও প্রতিবাদ করেন। কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে অবশেষে প্যাসেঞ্জারদের বিক্ষোভে টিকিট পরীক্ষকরা পালিয়ে যান।

যাত্রীরা ক্ষোভের সাথে বলছেন, এ তো ফাঁদে ফেলে টাকা ছিনতাই। লোকাল ট্রেন না থাকা সত্ত্বেও লোকাল টিকিট বিক্রি করে যাত্রীদের বিভ্রান্ত করে ট্রেনে উঠিয়ে বিপুল সংখ্যক টিকিট পরীক্ষক নামিয়ে অবৈধ জরিমানা আদায়। নাগরিক মঞ্চের নেতা তপন দাস জানান, রেলের এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর স্টেশন ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই রুটে ডেলি প্যাসেঞ্জাররাও আন্দোলন শুরু করেছেন। নির্বাচনের পরেই আন্দোলন তীব্র হবে বলে জানিয়েছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ।

একের পর এক দাবি আদায়

একের পাতার পর

অবসরকালে গ্র্যাচুইটি বাবদ ৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

লরি শ্রমিক ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল লরি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে জয় মাতা দি লরি ট্রান্সপোর্টে সকল শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই, এইচআর সহ বেতন বৃদ্ধির ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই শিল্পে এই প্রথম পিএফ, ইএসআই, এইচআর-এর মতো বিধিবদ্ধ সুবিধা পেলেন জয় মাতা দি ট্রান্সপোর্টের শ্রমিকরা।

মিড ডে মিল ঃ সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের আন্দোলনের মাধ্যমে কর্মীদের গ্রুপ ছাঁটাই বন্ধ হয়েছে।

প্রাণী বন্ধু ঃ সারা বাংলা প্রাণীবন্ধু কর্মচারী ইউনিয়নের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্র, প্রাণী সেবী ও এআই ওয়ার্কারদের ১৫০০ টাকা মাসিক ভাতা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০০ টাকা হয়েছে।

বিড়ি শ্রমিক ঃ বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের নেতৃত্বে আন্দোলনে উত্তর ২৪ পরগণায় হাজার বিড়ির মজুরি ১০টাকা বৃদ্ধি হয়েছে।

হকার ঃ বর্ধমান ও রায়দিঘিতে সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়ন ও বর্ধমান শহর জনপ্রিয় হকার্স ইউনিয়নের আন্দোলনের চাপে সরকার হকার উচ্ছেদ স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে।

বিদ্যুৎ গ্রাহক ঃ সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)-র আন্দোলনের চাপে ১) ২০১৬ সালের পর বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি হয়নি, ২) ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী লাইফ লাইন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, ৩) রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রাহক পরিষেবা না পেলে গ্রাহকদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে গ্রাহকদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, ৪) লক ডাউন সময়ে সিইএসসি-র পাঠানো অতিরিক্ত বিল স্থগিত নতুন করে বিল করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানীতেও অতিরিক্ত বিল সংশোধিত হয়েছে।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ঃ পশ্চিমবঙ্গের ১২৬টি পৌরসভায় কর্মরত ১৩ হাজার বিভিন্ন স্তরের পৌর স্বাস্থ্যকর্মী দীর্ঘ বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। নামমাত্র বেতনে দীর্ঘ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর শহর এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে চলেছেন এই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা। এদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন দুই বছর লাগাতার অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন চালিয়েছে, যার ফলে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যকর্মীদের কিছু দাবি মানতে বাধ্য হয়। প্রথম বেতন বৃদ্ধি হয় পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের শুধু তাই নয়, অবসরকালীন ভাতা গ্র্যাচুইটি তিন লক্ষ টাকা ঘোষণা করতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার।

এছাড়া কলকাতা সাবার্বন বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়নের আন্দোলন চলছে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে। সারা বাংলা মোটর ভ্যান চালক ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে টেম্পরারি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আদায় হয়েছে, পুলিশি জুলুমও বন্ধ হয়েছে। ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনে বহু জায়গায় স্কুল ফি কমেছে। যুব সংগঠনের আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য জয় এসেছে। মহিলা সংগঠনের আন্দোলনে বহু জায়গায় মদ নিষিদ্ধ হয়েছে। এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করা জরুরি।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘বামপন্থার ব্যাটন আজ আপনাদেরই হাতে’

এই বীরভূম জেলায় ১৯৬০-৭০-এর দশকে এস ইউ সি আই (সি) এবং এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন, আদিবাসী ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা আজও স্মরণ করে মানুষ। ভোটের সময় বহু প্রতিশ্রুতি জেলার মানুষ পেয়েছেন। কিন্তু সারা বাংলার মতো এখানেও তাঁদের অভিজ্ঞতা হল, কোটি কোটি টাকা ছড়ানো তৃণমূল, বিজেপি কিংবা বাম-কংগ্রেস-আব্বাস জোট নয়, সারা বছর মানুষের লড়াইতে পাশে থাকে এস ইউ সি আই (সি) দলটাই। বিশেষত বামপন্থার প্রতি যথার্থ আবেগ বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁরা ব্যথিত কংগ্রেস-আব্বাসদের হাত ধরে সিপিএম নেতাদের ঘুরতে দেখে।

আজ তাই বামপন্থার মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা ভাবছেন এস ইউ সি আই (সি)-র কথা। যেমন, রামপুরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী ফরিদা ইয়াসমিনের ভ্রাতৃস্থানীয় এক তরুণ। তিনি সিপিএম দলের সমর্থক, কিন্তু বাম-কংগ্রেস-আব্বাস জোট মেনে নিতে পারছেন না। তরুণটি বললেন, ‘আমি বামপন্থী মানুষ। এই পরিস্থিতিতে আমি যদি আপনাদের সঙ্গে কাজ না করি, তা হবে অপরাধ।’ নিজের রঙ-তুলি দিয়ে বেশ কিছু দেওয়াল লিখে দিয়েছেন তিনি এবং আরও লিখে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

হাসন কেন্দ্রে বোয়ালখালি গ্রামে প্রার্থী যূথিকা ধীবরের সমর্থনে হচ্ছিল গ্রুপ বৈঠক। বৈঠক শেষে অংশগ্রহণকারী এক কৃষক বললেন, ‘এতদিন বলতাম আপনাদের দল। আজ থেকে বলব আমাদের দল’। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দলের হয়ে কাজ করবেন।

বোলপুরে প্রচারের বক্তব্য শুনে একটি যুবক এগিয়ে এসে বললেন, ‘আমি মৌলানা আজাদ কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী মন থেকে এসএফআই করতাম। বর্তমানে সি পি এম কেবল নির্বাচনে কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য আইএসএফ-এর মতো এক সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধেছে দেখে আমি স্তম্ভিত। বামপন্থার ব্যাটন তো এখন আপনাদের হাতে। আমি আপনাদের সাথে কাজ করব।’

প্রতিদিনই কর্মীরা কাজ করতে গিয়ে এ ধরনের সমর্থন সূচক বক্তব্য পাচ্ছেন। আগে মানুষ বলত, আপনারা তো জিতবেন না। তাহলে ভোটে লড়ে কেন ভোট নষ্ট করছেন? এখন কিন্তু মানুষ এ কথা বলছে না।

হিমালয় বাঁচাও কমিটি উত্তরাখণ্ডে

হিমালয় অঞ্চলে প্রবল বন্যা, ধস ইত্যাদি বিপর্যয়ে মানুষ, বন্যপ্রাণী সহ প্রকৃতির বিরাট ক্ষতি হয়েই চলেছে। মাসখানেক আগে উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে এ রকম বিপর্যয়ে বহু মানুষ মারা গেছেন, নিখোঁজ হয়েছেন শতাধিক। বিশেষজ্ঞরা বরাবরই বলছেন, পাহাড়ি অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তবু সরকারের টনক নড়েনি। এই পরিস্থিতিতে উত্তরাখণ্ডের বিশিষ্ট জনেরা মনুষ্য-সৃষ্ট এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ১৫ মার্চ দেরাদুনে এক নাগরিক সভায় বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ডঃ এস পি সতি হিমালয়ের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন (ছবি)। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি এখানে গড়ে ওঠার বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের কথা তিনি তুলে ধরেন। উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ডি পি নওটিয়াল দেখান, কী ভাবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই প্রোজেক্টগুলি হচ্ছে। প্রবীণ সাংবাদিক শঙ্কর সিং ভাটিয়া এবং যোগেশ ভাট দেখান ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণে সরকার কী ভাবে দলবাজি করেছে।

সভা থেকে ‘হিমালয় বাঁচাও কমিটি’ গঠিত হয়। কনভেনর হয়েছেন ডঃ মুকেশ সেমওয়াল। কমিটির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রয়েছেন বিশিষ্ট গায়ক ও কবি নরেন্দ্রর সিং নেগি এবং সমাজকর্মী ও সাংবাদিক রাজীব লোচন। উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন সাংবাদিক যোগেশ ভাট, চারু তিওয়ারি, শঙ্কর সিং ভাটিয়া, বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন ডঃ এস পি সতি এবং ডঃ নবীন জুয়েল। ১৪ সদস্যের এই কমিটি উত্তরাখণ্ডের জন্য উপযুক্ত হিমালয়-নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গোয়ালিয়রে কর্পোরেট বিরোধী দিবস পালিত

এআইকেকেএমএস এবং এআইইউটিইউসি যৌথভাবে ১৫ মার্চ ‘কর্পোরেট বিরোধী দিবস’ পালন করে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে। সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ট্রেড ইউনিয়ন দেশ জুড়ে এই দিনটি পালনের ডাক দিয়েছিল

‘আত্মনির্ভর’ না ‘ভাঁওতানির্ভর’ বিজেপি!

ঝুপড়ির মধ্যে ৭০-৮০ বর্গফুটের একচিলতে ঘর। সেই তেঁতুলপাতায় গাদাগাদি করে ৮ জনের বাস। তাঁদের একজন বছর পঞ্চাশের লক্ষ্মীদেবী। কয়েক দশক ধরে এই ভাবেই সংসার করছেন কলকাতার বৌবাজারের মলঙ্গা লেনে। সেই তিনি হঠাৎ একদিন দেখলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর পাশে তাঁর ছবি! জানলেন, ওই ছবিতে তাঁর পিছনে থাকা পাকা বাড়িটাও নাকি তাঁর! হঠাৎ শুনলেন, মোদি সরকারের প্রকল্পে ‘আত্মনির্ভর’ হয়ে উঠেছেন তিনি!

অথচ বাস্তব বলছে, লক্ষ্মীদেবী বহু বছর ধরেই আত্মনির্ভর। স্বামীর মৃত্যুর পর ঠিকে শ্রমিকের কাজ করে তিন ছেলেকে একা হাতে মানুষ করেছেন। অথচ এত লড়াইয়ের পরেও একটা বলার মতো মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। ওই ৫০০ টাকার ভাড়ার ঘরে রাতে কেবল মেয়েরা থাকেন। ছেলেরা খোলা আকাশের নিচে কেউ ফুটপাথে, কেউ ভ্যানের উপর মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে তাদের সাফল্যের অন্যতম ‘মুখ’ লক্ষ্মীই। দরিদ্র পরিবারের দাবি, এর পর থেকেই চরম তামাশা চলছে তাঁদের নিয়ে।

লক্ষ্মীদেবী ও তাঁর পরিবারের দাবি এই প্রৌঢ়ার ছবি ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়ে আত্মনির্ভর হয়েছেন। গত ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর ছবি ব্যবহার করে ‘আত্মনির্ভর ভারত আত্মনির্ভর বাংলা’র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। যেখানে এক দিকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদেবী, পিছনে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পাওয়া বাড়ি, পাশেই হাসিমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর বক্তব্য, ‘পুরো মিথ্যে কথা। আমার ছবি ব্যবহার করে একটা মিথ্যে প্রচার করা হচ্ছে।’

(এই সময়, ২২ মার্চ ২০২১)

ভোটের প্রচার জেলায় জেলায়

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার

আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে প্রার্থী পীযুষ শর্মা ও ফালাকাটা কেন্দ্রের প্রার্থী তরণী রায় মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন

জয়নগর কেন্দ্রের প্রচার, দক্ষিণ বারাসাতে

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com